মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, বিজ্ঞানসাধক ও সংগঠক

ড. কুদরাত-এ-খুদার কয়েকটি কথা সব সময়ই আমার মনে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক সিলেকশন কমিটির সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় সবাই তরুণ তাত্ত্বিকবিজ্ঞানী। দুঃখের বিষয় উপাচার্য, ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান সবাই তাত্ত্বিকবিজ্ঞানের বিরোধী। তাঁদের কথা হল এই যে, বংলাদেশের মতো গরিব দেশে এখন ফলিত গবেষণার প্রয়োজন বেশি। ড. কুদরাত-এ-খুদা সকলের বক্তব্যের শেষে ধীরে ধীরে যে কয়েকটি কথা বলেছিলেন তা এখনও আমার মনে গেঁথে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে গবেষণা করা হয় তাকে তাত্ত্বিক বা ফলিত এভাবে ভাগ করা ঠিক নয়। আসলে এখানে সব পঠন-পাঠন এবং গবেষণা মূলত তাত্ত্বিক, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষকের মেধা নিয়োজিত হবে জ্ঞানের পরিসীমা বাড়ানোর জন্য। নতুন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপারে তার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। কাজ যদি ভাল হয় তবে একদিন না একদিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোথাও না কোথাও তার প্রয়োগ হবেই। ভাল কাজ যে করছে তাকেই উৎসাহ দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব— অন্য কিছু নয়।'

আমার মনে হয়েছিল কুদরাত-এ-খুদা সেদিন তাঁর সারাজীবনের বৈজ্ঞানিক কাজের পেছেন যে দর্শন ছিল সেটাই আমাদের মতো তরুণদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের গবেষণা সম্বন্ধেও এ ধরনের কথা ওঠে, তা তিনি জানতেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি রিং চেন টাউটোমেরিজম বা সেটরিও কেমিস্ট্রি নিয়ে যে কাজ করেছিলেন তা ছিল তাত্ত্বিক। তারপর সি.এস.আই.আর. গবেষণাগারে তিনি মাছ, ফল, চর্বি, কাঠি, মিষ্টি আলু, লেমন গ্রাস, দেশজ গাছ ইত্যাদ বিষয় নিয়ে যে অসংখ্য কাজ করেছেন সেগুলি ছিল অবশ্যই ফলিত গবেষণা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? পাটের ওপর ক্ষারের বিক্রিয়া তাঁর ১৯৬৪ সালের কাজ। এটা ফলিত না তাত্ত্বিক গবেষণা এ প্রশ্ন বাস্তবিকপক্ষেই হাস্যকর। বাংলাদেশে যাঁরা ফলিত বা তাত্ত্বিক কোন গবেষণাই কোন দিন করেননি তাঁরাই এসব প্রশ্ন অহরহ তুলে থাকেন এবং এভাবে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে থাকেন।

মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা বীরভূম জেলার মাড়গ্রামে ১৯০০ সালের ১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় পিতা খোন্দকার আবদুল মুকিত কলকাতায় তালতলার পীর সাহেবের বাসায় ছিলেন এবং পীর সাহেবই নবজাতকের নামকরণ করেন। আবদুল মুকিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হলেও কোন দিন ব্রিটিশের চাকরি করেননি। কুদরাত-এ-খুদা তাঁর ছেটেবেলার কথা এভাবে বলেছেন,

'আমরা ছিলাম পীর খান্দান। তবে বাবার মুরিদ সংখ্যা ছিল সীমিত। পরিবারের সবাই চাইতো আমি কোরানে হাফেজ হই। তাই ছোটবেলা থেকেই পবিত্র কোরান হেফজ করতে শুরু করলাম।

একদিন মজা হোল তখন গ্রীষ্মকালের ছুটি। আমার এক চাচাতো ভাই এলেন বাড়িতে। তিনি কলকাতার থেকে পড়াশোনা করতেন। আমায় তিনি এক পয়সা দিয়ে একখানা বর্ণবোধ কিনে দিলেন। সেদিন সকালে আমাকে অনেকগুলো পড়া করতে বললেন। দুপুরে দেখেন আমি খেলে বেড়াচ্ছি। আমায় ডাকলেন তিনি—'এই হতভাগা দৌড়ে বেড়াচ্ছিস যে, পড়া হয়েছে? আমি বললাম, 'হয়েছে'। তিনি বললেন, 'আন দেখি'। আমি বই এনে গড় গড় করে সব বলে দিলাম। তিনি আমার বাংলা পড়ার অভিনিবেশ আর মেধা দেখে চমৎকৃত হলেন। বাড়িতে বললেন, আমার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে তাঁর অনুরোধেই আমার স্কুলের পাঠ শুরু হয়। বেশ বড় হয়ে আমি পড়াশুনা করি।

মাড়গ্রাম এম.এ. স্কুলে আমি ভর্তি হই। সেখানকার পণ্ডিতমশায় আমায় খুব ভালবাসতেন। তাঁর চেষ্টা ও ভালবাসায় আমি পর পর দু'বছর ডবল প্রমোশন পাই।

উনিশশ' নয় কি দশ সালে আমি কলকাতায় যাই। সেখানে আমি ডভবার্ন এম.ই. স্কুলে ভর্তি হই। ছাত্র প্রায় সবাই মুসলমান ছিল। পড়াশোনার মাধ্যম ছিল উর্দু। আর সেখানে প্রায় হৈ-চৈ বাঁধত উর্দুভাষী আর বাঙালিদের মধ্যে। স্কলারশিপ নিয়ে এম.ই. পাস করার পর আমি কলকাতার মাদ্রাসায় ভর্তি হই এবং সেখান থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করি। সেটা ছিল ১৯১৮ সাল।

এরপর আরম্ভ হয় আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের জীবন। দীর্ঘ একটানা ছয় বছর। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই ১৯১৫ সালে আমি রসায়নবিদ্যায় এম.এসসি. পাস করি। কলেজ জীবনে আমায় সবচেয়ে বেদনা দিয়েছে ছাত্র এবং অধ্যাপকদের প্রবল সাম্প্রদায়িক মনোভাব।

রেজাল্ট বের হবার সময় এক ঘটনা ঘটল। সহপাঠী অশোক সেন এসে জানালেন— খবর খুব ভাল। তুমি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছ। পরে শুনলাম এক গোল বেঁধেছে। আমাকে আর আমার এক সহপাঠীকে ব্রাকেটে প্রথম করার চেষ্টা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে এক অধ্যাপক জানিয়েছিলেন আমার বন্ধু আমার থেকে একশত নম্বর কম পেয়েছিলেন। কিন্তু তার নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে আমার সমান করার চেষ্টা চলছিল। প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন স্যার পি.সি. রায়। তিনি তাঁদের বললেন, আরে ব্রাকেটে করতে চাও কিন্তু এ যে একশ নম্বরের ব্যবধান। এ কোন আইনে করবে? শেষ পর্যন্ত আমার শীর্ষ স্থান বহাল থাকল। তখন বিদেশে পড়ার জন্য ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো করে বৃত্তি দেয়া হতো। রাষ্ট্রীয় বৃত্তি। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাড়ি থেকে 'তার' করে এনে বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করতে বলেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আমার ভাগ্যে জোটে নি। স্যার আবদুর রহিম আমার কাছে সব শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট কাগজপত্র চেয়ে পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত গলদ ধরা পড়ল। আমি বিদেশ যাবার বৃত্তি পেলাম।

সেখানে থিসিস শুরু করলাম জে. এফ. থরপ-এর নিকটে। তিনি প্রথম দিকে আমায় ভালো চোখে দেখেন নি। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত পি.সি. রায় বিদ্বেষী। স্যার পি.সি. রায় একটা নিবন্ধে তাঁর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেছিলেন বলে প্রফেসর থরপের এ বীতশ্রদ্ধা। আমি পি.সি রায়ের ছাত্র তাই আমার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অবজ্ঞা। অপর ছাত্রদের তিনি থিসিসের আউটলাইন ও মূল বক্তব্যের ধারণাগুলো বলে দেন। কিন্তু আমার বেলায় তা করলেন না। বললেন, নিজে বুঝে স্বরচিত পথে কাজ করে যাও। এটা আমার শাপে বর হলো। নতুন পথে কাজ করতে করতে শেষে দেখা গেল আমি যা করেছি তা দিয়ে তিনটি থিসিস হয়। স্যার থরপ খুব খুশি হলেন। আমার এক-তৃতীয়াংশ কাজ সাবমিট করতে বললেন তিনি। ১৯২৯ সালে ডি.এসসি. নিয়ে দেশে ফিরলাম।

কিন্তু বিদেশী উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে আড়াই বছর আমার বসে থাকতে হয়। আমি ছিলাম একমাত্র মুসলমান ডি.এসসি. (ডক্টরেট অব সায়েন্স)। ডক্টর বর্ধনের অনুগ্রহে আমি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য আবেদন জানালাম এবং আমি একমাত্র মুসলিম ছাত্র যে এ বৃত্তি লাভ করেছিলাম। আড়াই বছর ধরে প্রেসিডেন্সি কলেজে এ বৃত্তি নিয়ে আবার একটি থিসিস শুরু করলাম। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন লন্ডনের থিসিসই আমি পেশ করব। আগে তা করা যেত। সেবারই প্রথম নতুন আইন হলো পুরানো থিসিস সাবমিট করা যাবে না, কিন্তু নতুন থিসিসের কাজ লন্ডনেই আমার করা ছিল। তাই আমার স্কলার হতে কোন অসুবিধাই হলো না।'

ড. কুদরাত-এ-খুদার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ১৯২৬ সালে লন্ডনের জার্নাল অব কেমিক্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি কার্বোক্সিসাইক্লোহেক্সেন এসিটিক এসিড তৈরি করা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯২৯ সালে ঐ একই জার্নালে কার্বোক্সি এসিটিল ডাইমিথাইল বিউটিরিক এসিডের রিং চেন টাউটোমেরিজম নিয়ে আলোচনা করেন। এর পরে এরা তিনটি প্রবন্ধে মোটামুটি ঐ একই বিষয়ের ওপর তাঁর পরবর্তী গবেষণালব্ধ ফলের বিবরণ দেন।

১৯৩০ সালের দিকে ড. খুদা স্টেরিওকেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সতের বছরে তিনি ইন্ডিয়ান জার্নাল অব কেমিস্ট্রিতে চৌদ্দটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকাতেও তিনি এ সময় 'স্ট্রেনলেস মনোসাইক্লিক রিং' এবং 'মাল্টিপ্লেনার সাইক্লোহেক্সেন রিং' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রিং সিস্টেমের ওপর তিনি যে তত্ত্ব দিতে চেয়েছিলেন তা অবশ্য জৈব রসায়নশাস্ত্রে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর গবেষণার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী তিনি ছিলেন না। রসায়ন শাস্ত্রের কোন শাখায় তাঁর যুগান্তকারী কোনে অবদানও নেই।' (জীবনী গ্রন্থমালা, বাংলা একডেমি, ১৯৮৭)। এ ধরনে মন্তব্য বিজ্ঞান গবেষণার মূল সূত্রটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থাকলেই করা যায়। বিজ্ঞানের অসংখ্য প্রথম সারির গবেষক বিশেষ বিশেষ ধারণা নিয়ে আজীবন কাজ করে যান সেসব ধরণার সবগুলিই যে সফল হয়, সার্থক হয়, তা নয়। কিন্তু তাই বলে তাদের মূল্য কম নয়। বিজ্ঞান স্বপ্নাদিষ্ট ব্যাপার নয় যে, আকস্মিকভাবে তা উদয় হয়। পৃথিবীব্যাপী সব বিজ্ঞানীদের মিলিত প্রচেষ্টার ফল যে বিজ্ঞান সেখানে প্রত্যেকেই যুগান্তকারী অবদান রাখতে পারেন না, কিন্তু প্রতিটি প্রয়াসের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে একজন নিউটন, আইনস্টাইন অথবা এমিল ফিশার।

সি.এস.আই.আর. গবেষণাগারের পরিচালক-সংগঠক হিসেবে ড. কুদরাত-এ-খুদা দেশজ সম্পদ নিয়ে গবেষণার দিকে জোর দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ে তিনি বনৌষধি ও গাছগাছড়ার গুণাগুণ, পাট, কাঠকয়লা এবং মৃত্তিকা, লবণ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ নিয়ে গবেষণা করেছেন। কবিরাজ ও হেকিমরা যে নাটাকরহ ব্যবহার করেন এর থেকে তিনটি রাসায়নিক উপাদান তিনি বিশুদ্ধ অবস্থায় নিষ্কাশন করতে পেরেছিলেন। তেলাকুচা থেকে তিনি বারটি যৌগ পেয়েছিলেন যা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুলসী, বিষ কাঁটালী, গুলঞ্চ, কালমেঘ ইত্যাদি থেকেও তিনি জৈবপদার্থ নিষ্কাশন করেছিলেন যার ব্যবহার সম্ভব। পাটকাঠি থেকে মণ্ড তৈরির প্রক্রিয়াও সি.এস.আই.আর. গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়। পাঠখড়ি থেকে কাগজ তৈরি তাঁরই গবেষণার ফল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ড. কুদরাত-এ-খুদা এ সম্বন্ধে লিখেছেন,

'পাটকাঠি নানাভাবে পরীক্ষা করা গিয়েছে এবং ফলে মনে হয় শিল্পের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কতিপয় উপায়েই হতে পারে। পাটকাঠির শতকরা ৭৫ ভাগ একরূপ মণ্ডে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে এবং সেই মণ্ড প্রয়োগে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দৃঢ় তক্তা প্রস্তুত করা গিয়েছে। এক সঙ্গে যে ঢেউতক্তা প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে মনে হয় একটি বিরাট শিল্প বির্বতন সংঘটিত হবে। এর সাহায্যে অনুরূপ আরও অন্য দ্রব্যও তৈরি করা সম্ভব। তারপর পাটকাঠির বিশেষ প্রথায় উৎকৃষ্ট সেলিউলোজ মণ্ডে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এই

উপায়ে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই এরূপ মণ্ডে পরিণত হয় এবং ঐ মণ্ড থেকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ উৎপন্ন করা হয়েছে। এই কাগজ নানা কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এর সাহায্যে যে প্যাকিঙ কাগজ তৈরি হয়েছে তাও অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

—সুতরাং পাটকাঠিকে আমাদের রূপালীকাঠি নাম দিলেও কিছু অত্যুক্তি করা হয় না।'

ড. কুদরাত-এ-খুদা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি করে দেশে ফিরলেও সহজে চাকরি পাননি। খাজা নাজিমুদ্দিন নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে, আজকাল ডি.এসসি. ব্ল্যাকবেরির মতো গণ্ডায় গণ্ডায় যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। সে যাই হোক, ১৯৩১ সালে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং পাঁচ বছর পরে তিনি বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৪২ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং চার বছর পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেই ফিরে আসেন অধ্যক্ষ হয়ে।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান না করে ডি.পি.আই.-এর পদ গ্রহণ করেন। জনশিক্ষা দপ্তরের পরিচালকের পদে থাকার সময় সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না, কেননা স্কুলে উর্দু শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বিরুদ্ধে তিনি মতপ্রকাশ করেন। ১৯৫০ সালে তাঁকে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়, কিন্তু করাচিতেও তাঁর জীবন আনন্দময় ছিল না। এক সময় তাঁর গৃহে রাত্রে ইট-পাটকেল পড়া শুরু হল এবং করাচিতে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। ১৯৫৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন যা তাঁর জন্য মোটেই উপযুক্ত পদ ছিল না। ১৯৫৫ সালে তাঁকে পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই গবেষণাগারের পরিচালকের দায়িত্বে কর্মরত থেকে অবসরগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদাকে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু আইয়ুব-মোনায়েম খানের চক্রান্তে সেখান থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। এই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ড. কুদরাত-এ-খুদার কর্মজীবনের এক বিশেষভাবে স্মরণীয় অবদান। এই প্রথম বাংলাদেশ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি সার্বিক আলোচনা এবং তার ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এক কর্মধারার সূত্রপাত করা হয়। কুদরাত-এ-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, 'উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশই আজ পর্যন্ত দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে নি। জনগণের কর্মদক্ষতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। কিভাবে আমরা এই জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন সাধন করব তার ওপর আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি নির্ভর করছে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, যারা উচ্চশিক্ষা থেকে লাভবান হবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে তারা সমাজের যে স্তরেরই হোক না কেন সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের অবশ্যই প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে এবং তার বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।'

আমরা জাতীয়ভাবে সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারিনি। গত কয়েক বছর যাবৎ কোন কোন রাজনৈতিক দলের বদৌলতে যেভাবে ক্যাম্পাস ভায়োলেন্সের ফলে উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে তাতে অনেকেই আজ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশাগ্রস্ত। বাংলাদেশের প্রতিভা তাই এখন আমেরিকার বিদ্যায়তনে পাড়ি জমাচ্ছে দলে দলে। এই অবস্থা দীর্ঘ দিন ধরে অব্যাহত থাকলে এদেশটি একটি মুর্খের দেশে পরিণত হবে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ড. কুদরাত-এ-খুদা শুধু যে একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী ছিলেন তাই নয়। বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনাতেও তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ছাড়া যে বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব হয় না একথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। এ ব্যাপারে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। ১৯৩৬ সালে ড. কুদরাত-এ-খুদাকে তদানীন্তন বাংলা সরকার শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের দায়িত্ব দেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সপ্তাহে একটি নিবন্ধ পড়লেন, নাম 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ'। সেখানে তিনি বলদৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন শিক্ষা কিছুতেই সম্পূর্ণ হতে পারে না মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া।

ড. কুদরাত-এ-খুদার প্রকাশিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থের মধ্যে বিশেষকরে উল্লেখ করা যায়, 'যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প' যা বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী' যা ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহার করার সৌভাগ্য হয়েছিল। এছাড়াও তিনি অনেকগুলো পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন।

ড. কুদরাত-এ-খুদা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ্যা বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। পাকিস্তান আমলে তাঁকে তমঘা-ই-পাকিস্তান ও সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল নিরভিমান মানুষ ছিলেন। এক সময় তাঁকে 'ন্যাশনালিস্ট মুসলিম' বলে মুসলিম লীগপন্থীরা প্রচার করত— কেননা তিনি কথায়-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে একজন খাঁটি বাঙালি ছিলেন। দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পাকিস্তান আমলে এদেশে রবীন্দ্র সাহিত্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তার প্রতিবাদে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর পরিবারের ধর্মীয় প্রভাবও তাঁর ওপর যথেষ্ট পড়েছিল। প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর তিনি কোরান শরীফ অনুবাদ করতেন।

পরিণত বয়সে ড. কুদরাত-এ-খুদা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৭৭ সালের ৪ অক্টোবর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ৩ নভেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। আজীবন বিজ্ঞান সাধক এবং মাতৃভাষার সেবক ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা একনিষ্ঠ জ্ঞান সাধনার যে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে।

Find More Bangla Ebook @ banglainternet.com